Downloaded from: justpaste.it/Mosjide_Zera-Saikh_AbdullahAzzam

মাসজিদে জিরার – ইমাম আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ)

[১] আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন বলেন –

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسۡجِدٗا ضِرَارٗا وَكُفۡرٗا وَتَفۡرِيقَۢا بَيۡنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَإِرۡصَادٗا لِّمَنۡ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبۡلُۚ وَلَيَحۡلِفُنَّ إِنۡ أَرَدۡنَآ إِلَّا ٱلۡحُسۡنَىٰۖ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ (١٠٧)

"আর কিছু লোক রয়েছে এমন যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, তারা (মুমিনদের) ক্ষতিসাধন করবে, কুফরি কথাবার্তা বলবে, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে এবং ঐ লোকের জন্য ঘাটি স্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে। তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা ভাল উদ্দেশ্যেই এটা করেছি। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা নিশ্চিত মিথ্যুক।" [সূরা তাওবাহ, ১০৭]

হাওয়াজিন পরাজয়ের পর আবু আমের কুস্তনতুনিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং রোমের বাদশা কায়সারকে আরব উপদ্বীপে আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করতে থাকে। আরবে যারা মুনাফিক ছিল, তাদের সাথে তাঁর চিঠি চালাচালি হতে থাকে। তারা এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য একটি ফাঁদ হিসেবে (মসজিদে জিরার)। আশঙ্কা ছিল যে তারা এটাকে রাসূলুল্লাহর ﷺ উপর ধ্বসিয়ে দিবে। আর এভাবে তারা তাঁকে হত্যার দুরভিসন্ধি করছিল।

একটু ভাল করে লক্ষ্য করুন, স্বয়ং রাসূল ﷺ তাদের মাঝে অবস্থান করছেন, একের পর এক যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে খোদায়ি মদদ (আল্লাহর নুসরাহ) প্রাপ্ত হচ্ছেন, তাঁর হাত ধরে ধারাবাহিকভাবে মুসলিম উম্মাহর বিজয় আসছে, এসব দেখে তারা তাঁর আমানতদারি এবং সত্যবাদিতার কথা ঠিক বুঝে নিয়েছে। তাঁর ওপর নিজ প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অগনিত নিদর্শন এবং অসংখ্য মুজিযা অবতীর্ণ হয়ে চলেছে, আর তারা পাশে থেকে দিনরাত এসব প্রত্যক্ষও করছে! তাদের মাঝেই নবীজি ﷺ তেরোটি বছর কাটিয়েছেন। তারপরও তারা তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করেই চলেছে। দিনরাত তাঁর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ চক্রান্ত করছে, তাঁর জন্য নানা ফাঁদ তৈরি করছে তাঁকে হত্যা করার জন্য নানা কৌশল আঁটছে, তাঁর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এবং তাঁকে বিদায় করার জন্য যারপরনাই চেষ্টা-পরিশ্রম ব্যয় করছে!

কুটিল স্বভাবের এসব মানুষের জন্য বয়ান এবং ওয়াজ নসিহত কোনো প্রভাবই সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি (তাও স্বয়ং রাসূলুল্লাহর ﷺ নসিহত)। দলিলের পর দলিল এসেছে, এতে যারা পরিতুষ্ট হওয়ার, তারা ঠিকই পরিতুষ্ট হয়েছে। আর যারা দুর্ভাগা, অসংখ্য অগণিত উজ্জ্বল প্রমাণ স্বচক্ষে দেখার পরও তাদের অবস্থা ছিল তথৈবচ! কুরআনে আল্লাহ বলছেন –

وَإِن يَرَوۡاْ كُلَّ ءَايَةٖ لَّا يُؤۡمِنُواْ بِهَا

"তারা যদি সকল নিদর্শনও দেখে নিত, এরপরও তারা তাতে ঈমান আনতো না।" [সূরা আনআম, ২৫]

এরপর যদি আমরা ইসলামি দাওয়াতের পন্থা ও পদ্ধতির দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে বিষয়টি মোটেও আশ্চর্যজনক বোধ হবে না। কারণ, এ তো মানবীয় স্বভাব! মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যাদের স্বভাব-প্রকৃতিই হচ্ছে বিনষ্ট! এমন কিছু লোকও রয়েছে যাদের উপর শয়তান ভর করেছে! অকাট্য দলিল-প্রমাণ এবং অন্যান্য সুস্পষ্ট বিষয়াদি দেখার পর কারও জন্য একেবারে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং, এখানে দলিল প্রমাণের বিষয় নয়, সত্য-মিথ্যারও কোনো বিষয় নয়, নবী-রাসূল সংশ্লিষ্টও কোনো বিষয় নয়; বিষয় হচ্ছে ভেতরের ভয়াবহ ব্যাধি, অপারেশনের ছুরি-তরবারিই কেবল যা সারাতে পারে।

[২]

আপনি যদি কাউকে আফগানের জিহাদ নিয়ে কোনো বিরূপ মন্তব্য করতে দেখেন তবে তাতেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। রাসূলের ﷺ ব্যাপারেও তো কথা হয়েছে। আর তা কখন? নবুওয়্যাতের দলিল-প্রমাণের উজ্জ্বল তেরোটি বছর তাদের মাঝে অতিক্রম হওয়ার পর। আর এমনকি তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলার দুরভিসন্ধিও করেছে। তারা তাঁকে গুপ্তহত্যার জন্য ফাঁদ পেতেছিল। উটের পিঠের রশি কেটে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল, যাতে করে নবীজির ﷺ উটটি কোনো উপত্যকা বা সংকীর্ণ জায়গায় পড়ে যায় এবং নবীজি ﷺ আঘাতপ্রাপ্ত হন। তবে তারা এতে সফল হল না। তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হল। ওহীর মাধ্যমে তাঁকে তাদের দুরইসন্ধির কথা জানিয়ে দেওয়া হল। তখন আম্মার ইবনু ইয়াসির (রদিআল্লাহু আনহু) মুনাফিকদের পক্ষে ব্যবহৃত মুশরিকদের উটের মুখে আঘাত করলেন। তারা চেয়েছিল, উটকে উত্তেজিত করে উটনী উপর লেলিয়ে দেবে, যাতে নবীজির উটনীটি পড়ে যায়, নবীজি ﷺ পড়ে যান! তাবূকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তাঁর উপর মসজিদ ধ্বসিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারাও তারা করেছিল।

ইসমাঈলিয়্যা ছিল ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত একটি শহর। সেখানকার সব মানুষ তখন সুয়েজ খাল কোম্পানির কর্মচারী ছিল। সুয়েজ খাল কোম্পানি ছিল ইংরেজদের। মানুষ হয়েও সেখানকার মানুষেরা ছিল কেমন যেন পশুর মতো; পানাহার করে আর গাধার মত হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে। দিনের বেলা এরা গাধা, আর রাতের বেলা মৃত ও নিথর দেহ।

এভাবে তারা সারাদিন গাধার মতো করে কাটাতো, রাতের বেলা নিজদের মাথাগুলো পশুর বিচালিতে রেখে ঘুমাতো। শায়খ হাসান আল বান্না (রহিমাহুল্লাহ) এই পরিস্থিতি দেখলেন। এই শ্রেণির লোকদের কাউকেই মসজিদে কখনো দেখা যেতো না। তিনি ওয়াজ নসীহত করার জন্য মসজিদে যেতেন। তখন যুবকশ্রেণির কাউকেই সেখানে খুঁজে পাওয়া যেতো না। অন্ধ, কর্মক্ষম এবং অশীতিপর বৃদ্ধদেরই কেবল সেখানে পাওয়া যেত। মসজিদে এসে তারা বসে বসে নামাজ আদায় করতো। নামাজ শেষে চা-কফির দোকানপাটে চলে যেত। সেখানকার মানুষগুলোর রুটিনই এমন ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়টুকু তারা কোম্পানির কাজে ব্যস্ত থাকতো। এরপর আসরের পর থেকে অর্ধরাত পর্যন্ত সময়টুকু এভাবে চা-কফির দোকানপাটে কাটিয়ে দিতো। সেখানে বসে তারা তাস খেলতো আর একটু পর পর কফির ধূমায়িত কাপে চুমুক দিত।

হাসান আল বান্না (রহিমাহুল্লাহ) চা-কফির এসব স্টলে যাতায়াত শুরু করলেন। তিনি সেখানে গিয়ে তাদের পাশে বসতেন। কখনো-বা এক কাপ কফি নিয়ে পান করতেন। এরপর আবার চুপ করে বসে থাকতেন। কখনো-বা এক কাপ কফি নিয়ে পান করতেন। এরপর আবার চুপ করে বসে থাকতেন। অন্যরা তখন তাস খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। তিনি তাদের মানসিকতা বুঝে ফেললেন। তিনি অনুধাবন করলেন, তারা গল্প শুনতে ভালবাসে। একদিন তিনি তাদের কাছে প্রস্তাব রাখলেন, তোমরা কী বলো? আমি তোমাদের এক জীর্ণ কলসির গল্প বলতে চাই। তারা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। এরপর জিজ্ঞেসই করে ফেলল, এ আবার কী গল্প? আচ্ছা, বলেই ফেলো। শুনেই দেখি।

তিনি তাদের গল্প বলতে শুরু করলেন। আবু জায়েদের গল্প, নেকড়ের গল্প, জীর্ণ কলসির গল্প – এইধরনের প্রাচীন সব গল্প। গল্প বলতে বলতে মাগরিবের নামাজের সময় হয়ে আসে। গল্পের খুব আকর্ষণীয় বাঁকে এসে তিনি তাদের কাছে অনুমতি চেয়ে বসেন, আচ্ছা, আপনারা যদি একটু সুযোগ দেন তাহলে আমি মাগরিবের নামাজ আদায় করে আসি। তারাও একপ্রকার অননয়োপায় হয়ে উত্তর দেয়, জি অবশ্যই। আপনি যান। নামাজ পড়ে আসুন। আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করি। এভাবে তিনি তাদের অপেক্ষায় বসিয়ে রেখে নামাজে চলে আসেন। আর তারা বসে বসে গল্পের চরিত্র নিয়ে নির্বিষ্টচিত্তে ভাবতে থাকে, এরপর কী হলো! এরপর কী হলো!!

এভাবে একদিন, দুই দিন, দশদিন পার হলো। তারাও ভাবতে লাগল, আমরা কেন এভাবে তার অপেক্ষায় বসে থাকছি? কেন তার সঙ্গে নামাজে যাচ্ছি না? নামাজ আদায় করে এসেও তো গল্প শোনা শেষ করা যাবে! এবার তারা এই চায়ের আসর থেকে মসজিদে যাওয়া শুরু করল। দাওয়াতের এই প্রবাদ পুরুষ তাদের চায়ের আসর থেকে তুলে মসজিদে নিয়ে গেলেন।

যখন মসজিদে আগত লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তিনি মসজিদে তাদের দরস বা পাঠদান করতে শুরু করলেন। মসজিদের ইমাম ভাবতে শুরু করলেন যে, এই লোক তো এখানে এসে তার কর্তৃত্বের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে। নামাজি দিয়ে মসজিদ ভরে যাচ্ছে। মুসল্লিও আর কেউ নয়, সুয়েজ খালের কর্মচারী যুবকেরাই, যারা তখন তার জীবনের

উন্মেষকাল অতিক্রম করছিল। বিষয়টি ইমাম সাহেবকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। তিনি এতে খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, শায়খ হাসান (রহিমাহুল্লাহ) মুসল্লি দিয়ে মসজিদ পূর্ণ করে তুলছেন। এতে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলেন, তাকে নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শুরু করলেন, তাঁর ব্যাপারে নানা প্রশ্ন-আপত্তি তুলতে লাগলেন।

অপরদিকে শায়খ হাসান আগত যুবকদের নবিগণের সবর ধৈর্য্য এবং নিজ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দাওয়াতের বিবরণ শোনাতেন। একবার তিনি তাদের নবি ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) এর ঘটনা শোনাচ্ছিলেন। মসজিদের যে শায়খ নিজ আধিপত্য কিংবা বলা চলে প্রজাতন্ত্রের নেতৃত্ব নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, তিনি তার আঙ্গুল তুললেন এবং শায়খ হাসানকে (রহিমাহুল্লাহ) উদ্দেশ্য করে বসলেন, 'ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) এর বাবার নাম কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'মুফাসসির আলিমগণ এ নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। কোনো কোনো মুফাসসির আলিম বলেছেন, "তাঁর বাবার নাম আযর।" কেউ বা বলেছেন, "তাঁর বাবার নাম ছিল তারুখ।" এবার ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "তারুখ! এ লোক আবার কে?"

একপর্যায়ে ইমাম সাহেব একথা প্রমাণ করতে যরপরনাই সচেষ্ট ছিলেন যে, "শায়খ হাসানের কাছে ভুল তথ্য রয়েছে"

শায়খ হাসান (রহিমাহুল্লাহ) ভাবলেন, এই শায়খ থেকে যেভাবে হোক মুক্তি পেতে হবে। তবে বাহ্যত তার থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় তো দেখছি না। তাই এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ভাল মনে হচ্ছে, তাকে বাড়িতে দাওয়াত করে আনা। যেই ভাবা সেই কাজ। শায়খ হাসান ইমাম সাহেবকে নিজ বাড়িতে দাওয়াত করলেন। তার মেহমানদারির জন্য জবরদস্ত আয়োজন করলেন। এরপর একদিন রাতে এনে শানদার মেহমানদারি করলেন। প্রথমে তার সামনে চর্বিযুক্ত সুস্বাদু গোশত পরিবেশন করলেন। গোশত দিয়ে মূল আহার শেষ করার পর দস্তরখানে ফল এল। তিনি তৃপ্তিভরে ফল খেলেন। এরপর সাহ্যখ হাসান তাকে নিয়ে গ্রন্থাগারের দিকে পা বাড়ালেন। সেখান থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে তাকে উপহার দিলেন এবং বললেন, "হে শায়খ! আমার পক্ষ থেকে আপনাকে এই সামান্য উপহার। শায়খ হাসান বলেন, এই ঘটনার পর আলহামদুলিল্লাহ সেই সমস্যার অবসান হয়। মূলকথা হল, কখনও এক ব্যক্তি একাই মাসজিদে জিরার হতে পারে।

[৩]

কুয়েতের মেয়েরা হাঁটুর উপরও পোশাক পরিধান করতো। এরপর শায়খ হাসান আইয়ুবের আগমন ঘটল। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি পুলিশের ব্যাটালিয়ন নিযুক্ত করলেন। ঘরে ঘরে পুলিশি নজরদারি চলল। তিনি মসজিদভিত্তিক জনসচেতনতা সৃষ্টিরও প্রয়াস গ্রহণ করলেন। তখন ক্রমান্বয়ে লোকেরা ফিরে আসতে শুরু করল। ঘরবাড়িয়ে হিদায়াতের প্রদীপ জ্বলে উঠতে শুরু করল। আর এভাবে সমাজের মোড় পরিবর্তন হল। এরপর যখন সেখানে ইসলামের সুন্দর আবহ তৈরি হল, কুয়েতের মানুষেরা বলতে শুরু করল, "হে হাসান আইয়ুব, আল্লাহ তোমার সবকিছু সহজ করে দিন, তিনিই তোমার জন্য যথেষ্ট!"

এরপর তিনি সৌদিতে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মব্যস্ত হলেন। জিদ্দাবাসীর প্রতি দ্বীনি মেহনত শুরু করলেন। জিদ্দার যুবসমাজের চারিত্রিক অবস্থা ছিল সকরুণ। তাদের অধিকাংশই উচ্ছন্নে গিয়েছিল। তারা অহর্নিশ গার্লফ্রেন্ড সঙ্গে কএ গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। দিনভর তাদের নিয়ে চক্কর দিয়ে বেড়াতো। মার্কেটে মার্কেটে ফষ্টিনষ্টি করতো। তাদের মূলত কোনো কাজ ছিল না, তারা ছিল বেকার। তাদের কাজই ছিল দিনভর অশ্লীল কুকর্মের প্ল্যান আঁকা, প্রবৃত্তির বাসনা চরিতার্থ করা এবং পাশবিক উত্তেজনাকে পরিতৃপ্ত করা।

শায়খ হাসান আইয়ুবের মাধ্যমে তারা দ্বীনের পথে ফিরে আসতে শুরু করল। হাজার যুবক জীবনের গতিপথ পাল্টে মসজিদমুখী হল। মসজিদগুলোতে এখন আর স্থান সংকুলান হয়না। তারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে মসজিদগুলোকে প্রশস্ত করল। দেখা গেল, তারপরও স্থান সংকুলান হচ্ছে না। অবশেষে মসজিদগুলোকে আরও বিস্তৃত করা হল। জিদ্দার হাজারো অধিবাসী – যারা কিনা সমাজের উচ্চশ্রেণির ব্যক্তিবর্গ, বড় বড় ব্যবসায়ী প্রমুখ – তারা শায়খ হাসান আইয়ুবের মসজিদে আসতে শুরু করল।

সেসময়ে কিছু বক্রস্বভাবের লোকজন নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করল, 'তোমরা তার বিরুদ্ধে কিছু একটা করো। কুয়েতের লোকেরা তাঁকে যেভাবে দেশছাড়া করেছে, তোমরাও জিদ্দা থেকে তাকে সেভাবে বহিষ্কৃত করো।'

এমন এক শায়খ – যিনিও একজন দাঈ ছিলেন, মানুষের সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতেন – তিনি বললেন, হাসান আইয়ুবের মসজিদই কেন মুসল্লিতে ভরপুর হয়ে যায়, অথচ আমাদের কাছে কেন একজন মানুষও

আসে না! আল্লাহর কসম! সে কিছুতেই এদেশে থাকতে পারবে না। ভাবা যায়, কীভাবে একজন শায়খ এমন জঘন্য কথার ব্যাপারে আল্লাহর নামে কসম খাচ্ছেন! এ শায়খ তো নিজেই তো একটি মাসজিদে জিরার, আস্ত মাসজিদে জিরার।
এর পরের অবস্থা আরও গুরুতর। তারা তাঁর পুরোনো বইপত্র ঘাটাঘাটি শুরু করল এবং অবশেষে ইসলামি আকিদাহসমূহের বিবরণ প্রসঙ্গে একটি বাক্য এবং তাতে মাত্র দুটো শব্দ খুঁজে পেল। তারা এটাকে নিয়ে শায়খ আবদুল আজিজের শরণাপন্ন হল। তাকে গিয়ে জানাল, "হে শায়খ, এই যে হাসান আইয়ুব, তাঁর আকিদাহ গলদ, ভ্রান্ত!" শায়খ তখন বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কী বলছেন আপনারা? কীভাবে তাঁর আকিদাহ গলদ, ভ্রান্ত? তারা তখন তার বই খুলে সেই বাক্যটি প্রদর্শন করল।
পত্রপত্রিকায় হাসান আইয়ূবের বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু হল। তাদের একজনের নাম আবু তুরাব জাহিরি, আরেকজনের নাম আবু তুরাব বাতিনি। তারা তাঁর বিরুদ্ধে লিখতে শুরু করল। আবু তুরাব জাহিরি হাসান আইয়ূবের আকিদাহ নিয়ে লিখতে শুরু করল! ব্যাপারটি বুঝতে পারছেন তো?
প্রচার করা হল, হাসান আইয়ূবের আকিদাহ ভ্রান্তিকর। হাসান আইয়ূব একদিন তাদের দাওয়াত করে বাড়িতে আনলেন। এরপর তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে মান্যবর ব্যক্তিবর্গ, আপনাদের অভিনন্দন! আচ্ছা বলুন তো আমার কাছে আপনাদের জন্য কী রয়েছে? আপনারা আমার কাছে কী চান? আমার কাইদা ভ্রান্তিকর? আমি তা আপনাদের হাতেই বিশুদ্ধ করে নিতে চাই! আমি আপনাদের কাছেই আল্লাহর কাছে তাওবাহ করতে চাই। আচ্ছা আমাকে বলুন, আমার কী ভুলভ্রান্তি রয়েছে? তারা বলল, 'এই যে বই! এখানেই তো আপনার ভ্রান্তিকর আকিদাহর উল্লেখ রয়েছে!' বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর তারা মুখস্তই করে রেখেছিল। তিনি তাদের বললেন, আপনারা এই বইটি রাখুন। এর ভেতরে যা আছে, সব মুছে ফেলুন। এরপর বিষয়গুলো শুধরে নিয়ে ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিন এবং এভাবে নতুন করে এর সংস্করণ করুন। নতুন এবং সহিহ আকিদাগুলো আপনারা যেভাবে চান তাতে আমার নাম যোগ করে দিন, আমি এতে কোনোই দ্বিমত করব না। বলুন, এব্যাপারে আপনাদের কী অভিমত? তারা বলল, ঠিক আছে, আমরা একমত হলাম, আমাদের কোনো আপত্তি নেই।'
(কিন্তু হায়!) এক সপ্তাহ কিংবা দু সপ্তাহ পর পত্রিকাগুলো আবারও হাসান আইয়ূবের আকিদার বিচ্যুতি নিয়ে লিখতে শুরু করল। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিও হাসান আইয়ূবকে বের করে দিলেন। মিশরের নাগরিকত্বও বাতিল করে হাসান আইয়ূবকে জামিয়া থেকে বের করে দেওয়া হল। কারণ কী? কারণ তাঁর আকিদা-বিশ্বাস গলদ! কারণ তাঁর আকিদাহ বিশ্বাস ভ্রান্তিকর!
মাসজিদে জিরারের ধারা চিরকালই থাকবে!
মুমিনদের ক্ষতির জন্য যেকোনো ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে, তা-ই মাসজিদে জিরার হিসেবে প্রতীয়মান হবে। সেসকল মাসজিদে জিরারকে সমূলে উৎপাটন করা একান্ত আবশ্যক। নবি করিম ﷺ চার সাহাবিকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা গিয়ে মাসজিদে জিরারকে ধ্বসিয়ে দেন, তাতে আগুন লাগিয়ে সম্পূর্ণ মসজিদ জ্বালিয়ে দেন। নবিজি ﷺ সেই স্থানটিকে আবর্জনার ডাস্টবিন বানিয়ে ফেলেন। মসজিদ পরিণত হল ময়লা ফেলার স্থানে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের নির্দেশ অনুসারে আর সেখানে দাঁড়াননি। মসজিদে জিরারের পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়েও চলাচল করা অনুচিত।...
[তাফসীরে সূরা তাওবাহ, ২য় খন্ড, ৩৬তম মজলিশ থেকে পরিমার্জিত]
শাইখের কিতাবের দ্বিতীয় খন্ড সাম্প্রতিক সময়ে বাংলায় অনূদিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। সেখানকারই প্রথম মজলিশের কিছু কিছু অংশ তুলে ধরলাম মাত্র। প্রতিটি কথায় ভাবার, শেখার এবং অভিভূত হওয়ার খোরাক রয়েছে। পুরোটা পড়ে অনুধাবনের আহ্বান রইল।
হকপন্থী মুজাহিদদের আকিদাহ, মানহাজ ইত্যাদি নিয়ে আজকেও কূটকথা বলার লোকের অভাব নেই। অনলাইনেই একেকটা 'মাসজিদে জিরার' হয়ে উঠা আইডির অভাব হয়না। শত বছরের আহকাম, ইজমা ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাওয়া, জিহাদ ফারদুল আইনের যুগেও বসে থাকা মানহাজের পক্ষে যতশত যুক্তি দেখিয়ে যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করা, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া সহ সেই কাজগুলো এখনও চলে আসছে।
কিতাবের অনন্য দিক হল, এটা যেন সময়কে উতরে গিয়েছে। আজ এই অবিসংবাদী ইমামকে নিয়েও মাসজিদে জিরার বনে যাওয়া কুলাঙ্গাররা কথা তোলে। কেউ আবার অন্যকোনো শাইখের হাউজ এরেস্ট থাকার সুযোগ নিয়ে তাঁর যোগ্যতা

নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সব মিলিয়ে ইমাম আবদুল্লাহ আযযামের কথাগুলো যেন আজকের দিনের গল্পও বলে যায়।
ময়দানে বছরের পর বছর নেতৃত্ব দেওয়া ইমামের কথায় যে কত বুঝ জড়িত থাকে তা একে ময়দানে না গেলে বোঝা যায় না। যিনি একাই ছিলেন এক উম্মাহ, তাঁর যুগ যুগ পূর্বের আলোচনা তো এই মুহূর্তে এই আমাদের উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে মনে হওয়া স্বাভাবিক! শাহাদাতের এত বছর পরও কথাগুলো কতই না জীবিত!
আল্লাহ শাইখকে সর্বোত্তমদের কাতারে কবুল করুন। আমাদেরকে সহিহ বুঝ দিন এবং সব ধরনের মাসজিদে জিরারের ফিতনাহ এবং অকল্যাণ হতে হিফাজত করুন। আল্লাহ আমাদেরকে সিরতল মুস্তাকিমে অটল অবিচল রাখুন এবং সর্বোত্তম শাহাদাত দিন। আমিন।